৫ লক্ষ কোটি ডলারের ভারতীয় অর্থনীতি

একের পাতার পর

হবে? এ নিয়ে তাঁর নিজের বা তাঁর মন্ত্রী-পারিষদ দলের কোনও উত্তর নেই। প্রশ্ন তো উঠবেই যে ২০ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি নিয়ে ট্রাম্প সাহেব যখন বেকার সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছেন, জাপান, জার্মানি, থেকে ইংল্যান্ড ভারতের থেকে বড় অর্থনীতি নিয়েও দেশের বেশিরভাগ মানুষের চাকরি, বাসস্থান সহ ন্যূনতম দাবি মেটাতে জেরবার, সেখানে নরেন্দ্র মোদি সাহেবের হাতে নিছক অর্থনীতির বহর বাড়িয়ে মানুষের সমস্যা সমাধানের কোন ম্যাজিক মজুত? এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেই 'নৈরাশ্যবাদী'!

মোদি সরকারের প্রথম দফার শাসনে আর্থিক সংকট চরমে পৌঁছেছে। হিসেবের কারসাজি করেও জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) বৃদ্ধির হার তলানিতে নেমেছে। ৭ লক্ষের উপর কলকারখানা নতুন করে বন্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এক বছরে কর্মচ্যুত হয়েছেন। প্রতি বছর হাজার হাজার সর্বস্বান্ত কৃষকের আত্মহত্যা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার কৃষিঋণ মকুব নিয়ে টালবাহানা করছে। ফসলের ক্ষতি পূরণ করে দিয়ে বাঁচাবার বদলে সরকার তাদের ঠেলে দিচ্ছে বিমা কোম্পানির খপ্পরে। সাধারণ মানুষের জন্য তেলের দাম বেড়েছে, জিএসটির হাত ধরে বেড়েছে বেশিরভাগ জিনিসের দাম। ২০১৭ সালে বিজেপি সরকার করপোরেটদের করছাড় দিয়েছিল ৮৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। শিল্প উৎপাদন বাড়েনি, বাড়েনি পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার। এই যখন জ্বলন্ত সমস্যা— তখন কোন পথে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে ভারত পৌঁছাবে, সেই প্রশ্ন তুললেই নৈরাশ্যের কারবারি হয়ে যেতে হবে?

নরেন্দ্র মোদির 'আশাবাদটি' কেমন? কেন্দ্রীয় বাজেটের আগের দিন প্রকাশিত আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্টে সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা সুপারিশ করেছেন, দেশের মানুষকে নিখরচায় ইন্টারনেট ডাটা ব্যবহারের সুযোগ দিলেই বাড়বে কর্মসংস্থান! না, পরিহাস নয়। রীতিমতো আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারি আর্থিক সমীক্ষা এই রকম আরও মণি-মুক্তো সাজিয়ে দিয়েছে দেশের মানুষের জ্ঞাতার্থে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাহেবের বহু-চর্চিত নোট বাতিল করে কালো টাকা ধরার আস্ফালন থেকে তাঁর অর্থনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর 'আশাবাদের' সাথে তাল মিলিয়ে নিজের চাকরি রক্ষার্থে আর্থিক উপদেষ্টা মশাই যা বলেছেন তাতে দেশের মানুষের চোখ আরও কপালে ওঠার জোগাড়। বলেছেন, একটু ধর্মভয় দেখালেই সব ট্যাক্স ফাঁকিওয়ালারা একেবারে সুড়সুড় করে কর দিয়ে দেবে। অবশ্য, আদানি-আম্বানি-বিড়লা-টাটা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর অতিপ্রিয় 'মেহুল ভাই' কিংবা নীরব মোদি, বিজয় মাল্য সাহেবরা পর্যন্ত কর ফাঁকি আর মন্দিরে উদার 'বিনিয়োগ' একই সাথে চালিয়ে যান কোন 'ধর্মবুদ্ধিতে' সেটা বলা নেই! যেমন বলা নেই, প্রবল রাম ভক্তের ভেকধারি বিজেপি লোকসভা ভোটে কালোটাকাকেই আশ্রয় করল কোন ধর্মবুদ্ধিতে?

হিসাব করার পদ্ধতি পর্যন্ত পাল্টে দিয়েও সরকারি সমীক্ষাও এবছর আর্থিক বৃদ্ধির হারকে ৬ শতাংশের উপরে দেখাতে পারেনি। ভারি শিল্প, খনি, পরিকাঠামো ইত্যাদি যে সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয় তার সবগুলিতে যে মন্দা, সে কথা অর্থমন্ত্রী চেপে যেতেই চেয়েছেন। কিন্তু কিছু 'আশাবাদের' রেখা তো দেখাতে হবে! তাই আর্থিক সমীক্ষা থেকে বাজেট সর্বত্র সরকারের বক্তব্য, বেসরকারি লগ্নি বাড়লেই তৈরি হবে কর্মসংস্থান। দেশের শ্রমজীবী মানুষের গড় বয়স কম থাকার জন্য তারা বেশি করে কাজ করবে আর তাতেই লগ্নির পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে! কিন্তু অর্থনীতির রোগ সারাবার জন্য সরকারি কর্তারা যে ওষুধটি সুপারিশ করছেন, তা পাওয়া যাবে কোথায়? দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে। ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে কোনও শিল্পজাত দ্রব্যেরই বাজার নেই। পরিকাঠামো শিল্প ধুঁকছে। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগই বা আসবে কোথা থেকে আর কর্মসংস্থানই বা হবে কোথায়? সরকার রপ্তানি বাড়াবার নিদান হেঁকে রোগ সারাতে চেয়েছে। কিন্তু একই সাথে সরকারের আর্থিক সমীক্ষাই জানিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে যে মন্দা চলছে তাতে রপ্তানি বাড়বার আর কোনও উপায় আপাতত নেই। বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে অনেক আশা দেখাচ্ছে সরকার। কিন্তু সে বিনিয়োগ কি আদৌ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে? সরকারের রিপোর্টই বলছে বেশিরভাগ বিদেশি বিনিয়াগ আসছে শেয়ার মার্কেটের ফাটকা কারবারে, নতুন কোনও শিল্পে নয়। অর্থাৎ এই বিনিয়োগের সাথে দেশে কর্মসংস্থান বাড়া বানতুন কলকারখানা খোলার কোনও সম্পর্কই নেই। এই বিদেশি বিনিয়োগের একটা বড় অংশ আসলে সিঙ্গাপুর, মরিশাসের মতো ট্যাক্সছাড়ের স্বর্গ বলে পরিচিত দেশগুলিতে ঘুরে আসা নিখাদ ভারতীয় পুঁজি। এ দেশের পুঁজিপতিরা প্রথমে ওইসব দেশে কিছু লোকদেখানো কোম্পানি খুলে বিনিয়োগ দেখায়, তারপর সেই পুঁজিকেই বিদেশি পুঁজি হিসাবে ভারতে বিনিয়োগ করে। ভারত সরকারের সাথে এই সমস্ত দেশের চুক্তির সুযোগ নিয়ে তাদের কর মকুব হয়ে যায়। এগুলি কোনও নতুন বিনিয়োগ তো নয়ই, বরং বড়সড় ধোঁকাবাজি।

আজ কৃষিক্ষেত্রের প্রধান সংকট চাষির ফসলের লাভজনক দাম না পাওয়া। সে সংকট মেটানোর ব্যবস্থা হবে কোথা থেকে? কৃষিক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগ চাষিকে কোনও সুরাহা দেওয়া দূরে থাক তাদের যে আরও বেশি বেশি করে অসহায় অবস্থার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে তা মহারাষ্ট্রের তুলো চাষিদের আত্মহত্যার মিছিলেই প্রমাণ হয়। তা হলে দাঁড়ালো কী? দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত, তারা বাঁচবার মতো আয় করার সুযোগটুকুও পাচ্ছে না। গ্রামীণ এলাকার মানুষ দলে দলে সামান্য কিছু কাজের আশায় শহরে ভিড় করছে। সেখানেও কাজ নেই। শ্রমিকদের মধ্যে ৯০ শতাংশ নিয়োজিত অসংগঠিত শিল্পে, যেখানে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি তো দূরের কথা, যা জোটে তাতে দুবেলা একটা পেট ভরাবার মতো টাকাও হাতে থাকে না। সংগঠিত শিল্প-ক্ষেত্রে, সরকারি চাকরিতে, রেল ইত্যাদিতে বেশিরভাগ চুক্তিভিত্তিক ঠিকা শ্রমিক দিয়েই কাজ চলছে। তাদের মজুরি যেমন সামান্য কাজের নিশ্চয়তাও নেই। এর সাথে যুক্ত হবে দেশের বিপুল বেকারবাহিনী। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্বীকারোক্তিতেই তা প্রায় ৬৬ কোটি। এদের বিশেষ কোনও রোজগার নেই। তা হলে দেশের শিল্প-কারখানায় উৎপাদিত জিনিস কিনবে কে? দেশের বেশিরভাগ মানুষের যদি ক্রয়ক্ষমতাই না থাকে তাহলে শিল্পে বিনিয়োগ করবে কোন পুঁজিমালিক?

তাহলে কোন ম্যাজিকে ৬ বছরের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ৫ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছাবে? আর যদি পৌঁছেও যায়, তাতে দেশের মানুষের কোন উপকারটি হবে? সরকার যখন বলে আর্থিক বৃদ্ধি হচ্ছে, জিডিপি বাড়ছে, তাতে দেশের মানুষের কী উপকার হয়? দেখা যায় যত 'আর্থিক বৃদ্ধি' হয় তত চাকরি কমে, কমে প্রকৃত মজুরির হার। দারিদ্র বাড়ছে। নরেন্দ্র মোদি সরকার মেক ইন ইন্ডিয়া বলে ব্যাপক ঢাকঢোল পিটিয়ে কিছু যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধ বিমান তৈরির বরাত দেশে নিয়ে এসেছে। সেগুলি তৈরি করবে আম্বানি-আদানি-টাটাদের মতো দৈত্যাকার কর্পোরেট গোষ্ঠী। তাতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লেনদেন হবে, তার হিসাব দেশের নিতান্ত গরিব মানুষের নুন-তেল কেনার যৎসামান্য খরচের সাথে জুড়ে দিয়ে বিরাট আর্থিক বৃদ্ধি দেখানো হবে। কিন্তু এই আর্থিক বৃদ্ধির ছিটেফোঁটা রেশও মধ্যবিত্ত বা গরিবের কাছে পৌঁছায় না। এই ফাঁপা বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুললে নৈরাশ্যের কারবার হয়, নাকি নরেন্দ্র মোদি সরকারের মিথ্যার কারবারের পর্দাফাঁস করা হয়!

এই পরিস্থিতিতে দরকার ছিল দেশের সমস্ত শ্রমিক-চাষির আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। তার জন্য দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ তাদের শ্রম দিয়ে যে মূল্য উৎপাদন করে তার অধিকাংশটা তাদের কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু তা করতে গেলে টান পড়ে পুঁজিপতিদের মুনাফায়। ১৯৮০-৮১-তে ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে ১০০ একক মূল্য উৎপাদনে শ্রমিকের মজুরির ভাগ ছিল ২৮.৫ শতাংশ। ২০১২-১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১১ শতাংশ (আইএলও, এশিয়া প্যাসিফিক ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, ২০১৭)। পরবর্তীকালে তা আরও কমে ৯ শতাংশের নিচে নেমেছে। অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত মূল্যের ৯০ শতাংশের বেশিটাই আত্মসাৎ করে মালিকশ্রেণি। এই পথেই দেশের বেশিরভাগ মানুষের সম্পদ গিয়ে জমা হয় করপোরেটদের সিন্দুকে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অর্থনীতির আকার যত বড় হবে মাথাপিছু তত বেশি আয় জীবনে সাফল্য নিয়ে আসবে। বলেছেন, মাথাপিছু বেশি আয় মানে তত বেশি ক্রয়ক্ষমতা, তত চাহিদা, তত উৎপাদন, তত কর্মসংস্থান এবং তত সঞ্চয়। মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ আর কাকে বলে! নানা কথার কারসাজিতে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল নিয়মটিকেই ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। তা হল, ক্রমাগত অসাম্য তৈরিই পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের সিংহভাগ অংশ প্রতিদিন উদয়াস্ত খেটে যে উৎপাদন করে চলেছে তার সুফল যায় কোথায়? যায় মুষ্টিমেয় মালিকদের পকেটে। তাই দেশের মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশ সম্পদ আজ কুক্ষিগত ১ শতাংশ পুঁজিপতির হাতে। দেশের মোট সম্পদের মাত্র ৪.৮ শতাংশ সম্পদ রয়েছে ৬০ শতাংশে মানুষের হাতে। ফলে আম্বানি আদানি টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কা মাহিন্দ্রাদের আয়বৃদ্ধি মানে তা রাম শ্যাম যদু মধু রহিমের আয়বৃদ্ধি নয়! পুঁজিবাদী বর্তমান ব্যবস্থায় মাথাপিছু আয় তো শিল্পপতি আর শ্রমিক— দু জনের আয়ের গড় হিসাব করেই ঠিক করা হয়। প্রধানমন্ত্রীও সেই হিসেবের কথাই বলেছেন। তাতে দেশের সাধারণ মানুষের উল্লসিত হওয়ার কোনও কারণ আছে কি? নাকি গত পাঁচ বছরের মতোই আরও পাঁচ বছর দেশের মানুষ আশা নিয়েই কাটিয়ে দেবেন। অবশ্য কিছুদিন পর অমিত শাহ এগিয়ে এসে বলতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা আসলে জুমলা— সত্যি সত্যি বলেননি।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী থানার অন্তর্গত পাটাহেসাল গ্রামের এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড অমূল্য ঘোষ দীর্ঘ রোগভোগের পর ৪ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে ছুটে যান এবং মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড অমূল্য ঘোষ সত্তরের দশকে তাঁর এলাকায় দলের কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন এবং ধীরে ধীরে নিজেকে একজন দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে গড়ে তোলেন। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে আর আই টি কলেজের মেসে কাজ নেন ও সেই সূত্রে পার্টির ঝাড়খণ্ড ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এলাকার সকলের প্রিয় অমূল্যদা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ১২ এপ্রিল তাঁর গ্রামেই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন প্রবীণ শিক্ষক কমরেড সুকুমার ঘোষ। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুবর্ণ কুমার এবং রঙ্গ লাল কুমার। স্থানীয় বহু কমরেডও তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণা করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ ও নির্ভীক কর্মীকে হারাল।

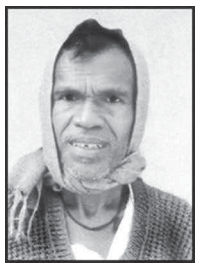

কমরেড অমূল্য ঘোষ লাল সেলাম

নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের এস ইউ সি আই (সি) কর্মী এবং এ আই এম এস এসের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিল সদস্য কমরেড উত্তরা রায় ১ জুলাই শক্তিনগর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর।

অল্প বয়স থেকেই গরিব অসহায় মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁদের বিপদে পাশে থাকাটা ছিল তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই হৃদয়বৃত্তির টানেই তিনি নদিয়া জেলার দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় 'হেলেন কেলার স্মৃতি বিদ্যামন্দির' গড়ে তোলার পর্বে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে দলের সাথে ও পরে এম এস এসের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়। কাজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে যে কোনও কাজই নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। হাই সুগার, আর্থারাইটিস, পেটের যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগে ৬-৭ মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এই শারীরিক সমস্যাকে আমল না দিয়ে মৃত্যুর আগের সপ্তাহের গণদাবীও তিনি একা দাঁড়িয়ে বিক্রি করেছেন, অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণাবলির কারণে পাড়ায়, কর্মক্ষেত্রে, দলের অভ্যন্তরে সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসতেন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ পার্টি অফিসে আনা হলে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

কমরেড উত্তরা রায় লাল সেলাম

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফেরাতে কেন্দ্র রাজ্যের টালবাহানা আর কতদিন চলবে

পরাধীন ভারতের সংসদকক্ষে জোরালো আওয়াজের বোমা নিক্ষেপ করে শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং বলেছিলেন, বধিরকে শোনাতে উচ্চকণ্ঠের প্রয়োজন। সেদিন ভারত ছিল ব্রিটিশের পদানত। আজ ব্রিটিশরা নেই। ক্ষমতায় আসীন দেশীয় শাসকরা। একদল কেন্দ্রে, একদল রাজ্যে। ঘটনা এটাই, আজকের শাসকরাও আন্দোলনের জোরালো কণ্ঠ, জোরালো দাবি ছাড়া সহজে জনগণের দাবি মেনে নেয় না। যেমন ঘটে চলেছে পাশ-ফেল ফেরানো নিয়ে।

এ ইতিহাস সকলেরই জানা, পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতি বিগত শতকের আটের দশকে প্রথম এ রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে চালু করেছিল সিপিএম সরকার। ২০১০ সালে শিক্ষার অধিকার আইনের মাধ্যমে তা গোটা দেশে চালু হয়। এবার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়। তখন কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেস জোট সরকার। এরপর শাসক বদল হয়ে কেন্দ্রে বিজেপি ও রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় বসলেও নীতির কোনও বদল হয়নি।

শিক্ষায় চরম সর্বনাশ নামিয়ে আনা এই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের শুরুও সেই প্রথম দিন থেকে। একসময় যার নেতৃত্বে ছিলেন ভাষাবিদ সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, অরবিন্দনাথ বসু, সুশীল মুখার্জী, শৈলেশ দে, মানিক মুখার্জীর মতো বরেণ্য মানুষেরা। সে আন্দোলন আজও অব্যাহত। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে পাশ-ফেল ফেরানোর দাবি আরও জোরদার হয়েছে। এর সামনে শাসকরাও বারে বারে তাদের কৌশল পাল্টেছে। এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপক জনমত ও আন্দোলনের প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারই অন্তত মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, পাশ-ফেল ফিরবে।

কিন্তু ফিরবে ফিরবে করেও পার হয়ে গিয়েছে কয়েকটা বছর। পাশ-ফেল ফিরবে, বিজেপি বলে চলেছে সেই ২০১৫ সাল থেকে। অথচ এর জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী সংসদের দুই সভায় পাশ করাতে তারা তিন বছর কাটিয়ে দিয়েছে। আবার সেখানেও চলছে এক মস্তবড় চালাকি। শিক্ষা আইনের সংশোধনীতে তারা বলেছে, পাশ-ফেল ফিরবে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে। এতে সমস্যা মিটবে?

২০১২ সালে হরিয়ানার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত রিভিউ কমিটি থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে শিক্ষা নিয়ে যত কমিটি হয়েছে, প্রতিটি কমিটিই তার রিপোর্টে এক বাক্যে বলেছে, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে শিক্ষার মান দ্রুত নামছে এবং তার জন্য দায়ী পাশ-ফেল বিসর্জনের নীতি। শিক্ষক অভিভাবকসহ সমস্ত শিক্ষানুরাগী মানুষের অভিমতও তাই। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফিরিয়ে শিক্ষার এই অবনমন ঠেকানো যাবে না। তার জন্য দরকার প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল প্রথাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা।

রাজ্যে তৃণমূল সরকারের ভূমিকাতেও সেই একই চালাকি। ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফেরানোর দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকা এক বনধের পক্ষে অভূতপূর্ব জনসমর্থন দেখে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, তাঁরাও এই দাবির পক্ষে। তাঁরাও চান, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফিরুক এবং পরের শিক্ষাবর্ষ, অর্থাৎ ২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে তাঁরা তা চালু করবেন। ২০১৮ সাল চলে গিয়েছে। ২০১৯ যেতে বসেছে। এখনও তাঁদের ঘুম ভাঙেনি।

রাজ্যে ইতিমধ্যে বেশ কয়েক হাজার প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুল ছাত্রের অভাবে বন্ধ এবং বন্ধ হওয়ার মুখে। তবুও তাঁদের চেতনা ফেরেনি। তাঁরা শুধু সরকারি স্তরে একটা কমিটি করেই দায় শেষ করেছেন। এই কমিটি হাতে গোনা কয়েকটা স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের চোখ রাঙিয়েছে এবং পরে সুপারিশ করেছেন, কুড়ির কম ছাত্র হলে সে স্কুল বন্ধ করে দাও এবং সেখানে ইংরেজি-মিডিয়াম স্কুল চালু কর।

একসময় যে সব স্কুলে ছাত্রদের বসার জায়গা দেওয়া যেত না, কেন সেইসব স্কুল আজ ছাত্রের অভাবে ধুঁকছে— এর কারণ যদি সত্যিই তাঁরা খুঁজে পেতে চাইতেন তবে তাঁরা দেখতে পেতেন, এর কারণ অভিভাবকরা এই সব স্কুলের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং এই আস্থা হারিয়ে ফেলার কারণ সরকারি ও সরকার পরিচালিত স্কুলগুলির পাশ-ফেল বিহীন শিক্ষাব্যবস্থা। যার পরিণতিতে এখানে পড়াশোনার পরিবেশটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জামা-জুতো-ব্যাগ-মিড-ডে মিল দেওয়া হচ্ছে, স্কুলবাড়ি রঙ সবই হচ্ছে— কিন্তু স্কুলের যেটা আসল কাজ সেই শিক্ষাটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। অভিভাবকরা নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেরা না খেয়ে না পরেও বেসরকারি স্কুলের দিকে ছুটছেন। এই সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা কি তা দেখতে পাচ্ছেন না? নাকি দেখেও দেখতে চাইছেন না? এবারের লোকসভা ভোটে পায়ের তলা থেকে অনেকখানি জমি সরে যাওয়ার ঘটনায় ধাক্কা খেয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ফেসবুকে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের উদ্দেশে শিক্ষা নিয়ে কোনও পরামর্শ থাকলে সরাসরি তাঁকে জানানোর আবেদন জানিয়েছেন। বিষয়টা কিছুটা অভাবিত। কারণ এ হেন শুভবুদ্ধির প্রকাশ তাঁদের মধ্যে আগে কখনও ঘটতে দেখা যায়নি। তবুও এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকে তাঁদের মতামত পাঠিয়েছেন। এইসব মতামতের কী পরিণতি হবে, আমরা জানি না। তবে এ প্রশ্ন এসেই যায়, এ সবের কোনও গুরুত্ব কি তাঁদের কাছে আছে, না এর সবটাই মানুষকে বোকা বানানোর আর একটা অপকৌশল? যদি তা না হয়, তবে সব দেখেশুনেও কেন তাঁরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন? জনস্বার্থ, শিক্ষাস্বার্থ তাঁদের কাছে এতটুকু গুরুত্ব পেলে তো তাঁদের ছটফট করার কথা। কীভাবে এই সর্বনাশ ঠেকানো যায় তা নিয়ে তাঁদের মরিয়া চেষ্টা চালানোর কথা। কোথায় তাঁদের সেই উদ্বেগ, সেই যন্ত্রণা?

শিক্ষা এখনও যুগ্ম তালিকায়। এখানে রাজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালনের সামান্যতম চেষ্টাও তাঁরা করেছেন কি? আর কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁরা কখনও সংঘাতে যাননি, এমন তো নয়। নানা সময় নানা প্রশ্নে তাঁদের সাথে কেন্দ্রের বিরোধ হয়েছে। দু'দিন আগেও ভোটের মুখে এমনকী প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে কড়া মন্তব্য করতেও তাঁদের বাধেনি। এখনও রাজ্যের বিষয়ে কেন্দ্রের অতি-সক্রিয়তা নিয়ে তাঁরা সরব। তা হলে শিক্ষা নিয়ে তাঁরা এত নিস্পৃহ, এত নির্লিপ্ত কেন? কেন তাঁরা এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের একান্ত আজ্ঞাবহের মতোই আচরণ করছেন? এমনকি অনেক টালবাহানার পর লোকঠকানোর জন্য পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল ফেরানোর যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্র নিয়েছে তা কার্যকর করা নিয়েও তাঁরা গড়িমসি করে চলেছেন। এই নিষ্ক্রিয়তা এক সামাজিক অপরাধ। কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা রাজ্যের মানুষ মুখ বুজে মেনে নেবে না।

সংখ্যালঘু বিশিষ্টদের চিঠিতে বিজেপির মিথ্যা প্রচারের পর্দা ফাঁস

কলকাতার পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট মুসলিম নাগরিক গত ১৮ জুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে এক পত্রে আবেদন করেছেন, রাজ্যে সংঘটিত কোনও অপরাধের ক্ষেত্রেই প্রশাসন যেন ধর্মবিচার না করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এই পত্রের প্রেক্ষিতটা ছিল এন আর এস হাসপাতালে ডাক্তারদের উপর হামলা এবং জনৈক অভিনেত্রীর ট্যাক্সি ঘিরে কিছু দুষ্কৃতীর অভব্য আচরণ। উভয়ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা ছিল ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম। এই সুযোগ বিজেপি হাতছাড়া করতে চায়নি। তাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ঘটনা দু'টিতে সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে বলতে থাকেন, মুসলিম বলেই অপরাধীদের শাস্তি হচ্ছে না।

নির্বাচনে ফায়দা তোলার জন্য ধর্মীয় মেরুকরণ সৃষ্টির কাজে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও দেশের অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলিও এই কৌশল কমবেশি ব্যবহার করে থাকে। আর তাদের এই সাম্প্রদায়িক দুষ্ট রাজনীতির ফলে সমাজ-জীবনে অবিশ্বাস ও বিভাজনের এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়ে চলেছে, বিষাক্ত হয়ে উঠছে সমাজমনন। এই প্রেক্ষিতেই ওই বিশিষ্ট মুসলিম নাগরিকদের এই চিঠি।

তাঁরা বলেছেন অপরাধীকে আইনি পথেই বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনও যুবক যদি জড়িত থাকে, তাকেও যেন রেয়াত করা না হয়। তাঁরা মনে করছেন, একে ব্যবহার করে কায়েমী স্বার্থবাদীরা মুসলিম তোষণের অভিযোগ তোলার সুযোগ পেয়ে যাবে। এতে ধর্মীয় বিভাজন বাড়বে এবং তার ফলে মুসলিম সমাজেরই ক্ষতি হবে। নেট দুনিয়া সহ নানা প্রচারের মধ্য দিয়েও একের বিরুদ্ধে অপরের ঘৃণা উগরে দেওয়া বাড়বে। তাঁদের সম্প্রদায়ের হাজারো মানুষকে সমাজের চোখে অভিযুক্ত হিসাবে দাঁড় করানোর বিষয়টি আরও বাড়বে। এই সব 'নীরব অভিযুক্ত'দের হয়েই তাঁদের এই চিঠি।

ভোট রাজনীতির কী করুণ পরিণতি! জাতীয়-জীবনের বিরাট পরিসরে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ নিজেকে সাবলীলভাবে মেলে ধরতে পারবে— এর নামই তো গণতন্ত্র। অথচ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরও বেশি করে অবিশ্বাসের পাত্র করে তোলা হচ্ছে। বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদের জিগির আজ এমনভাবেই সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, খাদ্যাভাব, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতার মূল কারণকে আড়াল করে সম্প্রদায়গত বিভেদকেই তারা সামনে নিয়ে আসছে। নইলে এন আর এসের ডাক্তার নিগ্রহের ঘটনার কারণ যেখানে হাসপাতালের উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব ও নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা, অভিনেত্রীর ট্যাক্সিতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের পিছনের কারণ যেখানে আইন-শৃঙ্খলার খামতি, যেখানে বিজেপি সাম্প্রদায়িক রঙ চড়াতে গেল কেন? সমাজের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে যারা খাদ্য, শিক্ষা, চাকরি সহ সবরকমের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যথার্থ শিক্ষার অভাবে তাদের একটা অংশ অন্ধকার পথের শিকার হয়ে উঠে। এর সাথে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের কোনও যোগ নেই। সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের অবাধ সুযোগসৃষ্টির পরিবেশই এদের আবার আলোর পথে টেনে আনতে পারে। বিজেপি এই সত্যটাকেই আড়াল করতে চাইছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষের বৈচিত্র্যকে নিয়েই ভারতীয় জাতিসত্তা গড়ে উঠবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহনশীলতার মধ্য দিয়ে। আজ স্বাধীন ভারতের শাসকেরা সেই বিশ্বাস ও সহনশীলতার পরিবর্তে অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে চলেছে মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে। যাতে সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ একজোট হয়ে লড়তে না পারে, যেমনটি ব্রিটিশরা চেয়েছিল। ধর্মগত, বর্ণগত, প্রদেশগত বিভেদকে দূর করে 'মানুষ' পরিচয়ে সকলকে মেলানোর যে মানবিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, সেদিন গান্ধীবাদী নেতৃত্ব তা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেননি। সেদিন হিন্দু মহাসভা, আরএসএস বা মুসলিম লিগের মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধ বাড়াতেই কাজ করে গেছে। সেকুলার মানবতাবাদের আদর্শকে গ্রহণ না করা এবং ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের সাথে আপস করার ফলে একটা অখণ্ড জাতি হিসাবে ভারতের গড়ে উঠা সম্ভব হয়নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় নবজাগরণের বলিষ্ঠ চিন্তাকে পাথেয় করে যে সামাজিক আন্দোলনের ধারা গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে সেই ধারাটি গৌণ হয়ে পড়ে। ফলে ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে একটা সার্বভৌম জাতি হিসাবে গড়ে উঠলেও, সামাজিক মননে, সংস্কৃতিতে এক হয়ে উঠতে পারেনি। পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের মতো স্বাধীন ভারতের শাসকরাও জনসাধারণের ঐক্য ভাঙতে এই সুযোগকেই গ্রহণ করেছে। তার জের ভোগ করতে হচ্ছে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে।

এর প্রতিকার কী? ভোটসর্বস্ব এই দলগুলির হীন রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রকৃত সেকুলার শক্তির উত্থান ঘটাতে হবে এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেই বিভেদ দূর হবে, ঐক্য গড়ে উঠবে। এ ছাড়া কোনও সহজ রাস্তা নেই।

বিজেপি-শিবসেনার কাটমানি খাওয়ার পরিণতি

দেওয়াল ভেঙে মুম্বাইয়ে ৩০ জনের মৃত্যু

প্রবল বৃষ্টির দাপটে দেওয়াল ভেঙে পড়ে মুম্বাইয়ের মালাডে প্রাণ চলে গেল ২৭ জনের এবং কল্যাণ শহরে আরও ৩ জনের। আহত হয়েছেন দেড় শতাধিক। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল কী ভাবে? এ কি শুধুই প্রকৃতির তাণ্ডব? না। মিউনিসিপ্যালিটির একটা জল-নিকাশি প্রকল্পের জন্য বছর দেড়েক আগে এই দেওয়াল যখন গাঁথা হয়েছিল, তখনই তাতে কন্ট্রাক্টর ও প্রশাসনিক কর্তাদের যোগসাজসে নিম্নমানের দেওয়াল তৈরির অভিযোগ উঠেছিল। দেওয়ালের একদিক বরাবর ছিল অসংখ্য দরিদ্র মানুষের বাস। মুম্বাইয়ে জল-নিকাশের পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে এই প্রকল্পের কাজ চলছে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। শুধু এটাই নয়, রাজ্যের বহু নিকাশি প্রকল্পের নির্মান ও মেরামতির কাজ চূড়ান্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সরকারে থাকা শিবসেনা-বিজেপি এই অবহেলা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। শুধু তাই নয়, তারা এর থেকে কাটমানি খেতেই ব্যস্ত থেকেছে। পূর্বতন কংগ্রেস বা এনসিপি পরিচালিত বোর্ডও তাই করেছে।

এসইউসিআই(সি) দলের মুম্বাই সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী বলেন, "এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ দায় রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি-শিবসেনা সরকারের। অবিলম্বে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত জলাধার ও নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা ঠিক করতে হবে। মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে হবে।" তিনি বলেন, "নিরপেক্ষ তদন্ত করে এই দুর্ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী কন্ট্রাক্টর ও প্রশাসনিক কর্তাদের শাস্তি দিতে হবে। নিহতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং আহতদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত সরকারকে করতে হবে।"

তমলুক পৌরসভায় নাগরিকদের ধরনা

পৌরকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে তমলুক পৌর নাগরিক সমিতির ধারাবাহিক আন্দোলনে অনেক নাগরিকের কর কমলেও আজও কর কাঠামোর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং নিয়ম রচিত হয়নি। এ ছাড়া পৌর এলাকার ড্রেন সংস্কার, বেহাল রাস্তাগুলির মেরামত, বিভিন্ন গলিতে আলোর ব্যবস্থা, পানীয় জলের সংকট দূর করা, শহর পরিচ্ছন্ন রাখা, মশা নিয়ন্ত্রণ, মূল রাস্তায় যত্রতত্র টোটো দাঁড়ানো বন্ধ করা, মাদক দ্রব্য বিক্রি রোধ, মদের দোকান বন্ধ করা প্রভৃতি দাবি আজও পৌর কর্তৃপক্ষ কার্যকর করেনি। এই সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ৪ জুলাই বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয় নাগরিক সমিতি। সমিতির সভাপতি নন্দকুমার ভৌমিক জানান, চেয়ারম্যান অধিকাংশ দাবি কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন।

হলদিবাড়িতে কৃষি আধিকারিককে ডেপুটেশন

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে গরিব কৃষক, ভাগচাষি ও খেতমজুররা আজও কৃষি পেনশন পাননি। অবিলম্বে পেনশনের দাবিতে অল ইন্ডিয়া কিষাণ-খেতমজদুর সংগঠনের হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ২৪ জুন ব্লক কৃষি আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, যতটুকু পেনশন বরাদ্দ ঘোষণা হচ্ছে তাও শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যরা কুক্ষিগত করছে। যেটুকু মিনিকিট বরাদ্দ হয় তাও তারাই হাতিয়ে নেয়। কৃষিদপ্তর থেকে গরিব চাষিদের জন্য কী পরিমাণ সহায়তা দেওয়া হয় তার কোনও তালিকা কার্যালয়ের সামনে কৃষকদের জানানোর জন্য টাঙানো হয় না। বছরে যে কৃষিমেলা হয় তাতে বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের কোনও প্রতিনিধিতে কমিটিতে রাখা হয় না, এমনকী চিঠি দিয়ে জানানোও হয় না।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, কৃষি দপ্তরকে শাসক দলের দালালদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে কোনও সরকারি সাহায্য বণ্টনে সব কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের জানিয়ে তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত দরিদ্র কৃষক, ভাগচাষি ও খেতমজুরদের কৃষি পেনশন দিতে হবে। কৃষি-বিমার আবেদন যাঁরা করতে পারেননি তাঁদের নতুন করে আবেদনের সুযোগ দিতে হবে। কৃষকদের সমস্ত শস্য সরকারি উদ্যোগে কিনতে হবে। কেপিএসদের নিয়মিত এলাকায় কৃষি পরিদর্শনে যেতে হবে।

মিড ডে মিল

একের পাতার পর

দিনের ভবিষ্যৎ যে শিশু, তাদের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা করে চলেছে সরকার। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ ছাত্রের আর্থিক দুরবস্থার কথা যদি সত্যই ক্ষমতাসীন দলগুলি ভাবত, তাদের প্রকৃত শিক্ষাদানের কথা, তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের কথা ভাবত, তবে এই হাস্যকর বরাদ্দ তাঁরা করতে পারতেন না। অর্থ এই ক্ষেত্রে কোনও বাধা হতে পারে না। তারা চাইলেই সাংসদদের জন্য সরকারি ক্যান্টিনে বিরিয়ানি নামমাত্র মূল্যে না দিয়ে, সাংসদ-বিধায়কদের বেতন না বাড়িয়ে, সামরিক খাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে, ধনকুবেরদের উপর কর বাড়িয়ে, পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে, ঋণ খেলাপি বৃহৎ পুঁজির মালিকদের ঋণ-মকুব না করে মিড ডে মিল খাতে বরাদ্দ বাড়াতে পারত। ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর একটি মন্তব্যও, বরাদ্দ তো দূরের কথা।

শিশুদের পাশাপাশি সারা দেশে ২৬ লাখের বেশি মিড ডে মিল কর্মী রয়েছেন, তাদের মধ্যে ৯৮ শতাংশই মহিলা। তারা দিন রাত মুখে রক্ত তুলে পরিশ্রম করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি চালু রাখেন, শিশু ও মায়েদের পুষ্টিবৃদ্ধির সরকারি প্রকল্পের কাজ করে যান নিরলসভাবে। অথচ তাদের বাঁচার মতো মজুরি দেয় না সরকার। বাজার, হিসাব, রান্না থেকে শুরু করে তাদের নানা কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়। বিনিময়ে মাস গেলে মজুরি মেলে মাত্র হাজার টাকা অর্থাৎ দৈনিক ৩৩ টাকা। যেন দয়া করে সরকার তাদের ভাতা দেয়। মিড ডে মিল কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছেন, দৈনিক ৩৩ টাকায় কেউ সংসার চালাতে পারে কি? এই অসহায় শিশু, যাদের মিড-ডে মিল বা সরকারি স্কুলের উপরই ভরসা করে থাকতে হয়, তাদের প্রতি একটু দরদ দরকার। আর দরকার মিড-ডে মিল প্রকল্পের পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকারের উপযুক্ত পরিকল্পনা। কিন্তু ভোটে জিতে আসা সব দলই এটাকে অবহেলার চোখে দেখে। কারণ এই শিশুরা, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মিড-ডে মিল কর্মীরা তাদের আর কী দিতে পারে? উল্টো দিকে পুঁজিপতিদের, ধনকুবেরদের আর্শীবাদ ধন্য হয়েই মসনদে আসীন হয় এই সমস্ত ক্ষমতাপিপাসু দলগুলি।

নামেমাত্র মিড ডে মিল প্রকল্প রেখে সরকারের বাহাদুরি নেওয়ার কী আছে? দায়িত্ববোধহীন বিজেপি সরকারের 'বেটি বঁচাও, বেটি পড়াও' স্লোগান কি শুধুই কথার কথা নয়?

বাজেটে কথার ফুলঝুরি ছোটালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

২০১৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশের পরপরই ৫ জুলাই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন।

মেহনতি জনগণ, বিশেষত দুর্দশাক্লিষ্ট শ্রমিক-কৃষকদের জীবন-জীবিকা ধ্বংসকারী সমস্যাগুলিকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে মহা আড়ম্বরে সংসদে যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হল তা শুধুই বিপুল মিথ্যা দাবি, রীতিমাফিক প্রতিশ্রুতি, কারচুপি ভরা পরিসংখ্যান, বিরক্তিকর বাগাড়ম্বর এবং দুর্বল অংশের মানুষের জন্য সাজানো উদ্বেগে পূর্ণ। বাস্তবে এই বাজেট হল ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব করার লক্ষ্যে সযত্নরচিত আরও একটি পরিকল্পনা। বাজেট ভাষণ শুনে মনে হয় দেশের মানুষ ও অর্থনীতি— সব কিছুই বহাল তবিয়তে রয়েছে। সর্বোচ্চ বেকারি, ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে কর্মহীন করে দিয়ে প্রায় ৭ লক্ষ কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফসলের উপযুক্ত দাম না পেয়ে প্রায়শই চাষির ফসল নষ্ট করে দেওয়া, এমনকী চরম হতাশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া— বাজেটে এসবের কোনও উল্লেখই নেই। এমনকী যে ভয়ঙ্কর জলসংকটে ব্যাপক অংশের খরাপীড়িত মানুষ এবং বেশ কয়েকটি বড় শহর জর্জরিত, তারও কোনও উল্লেখ নেই বাজেটে। এসবের পরিবর্তে ৪০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসা করা সংস্থার কর্পোরেট কর কমিয়ে ২৫ শতাংশ করে দেওয়ার কথা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছে সরকার। বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলি এর পর তাদের ব্যবসা ছোট ছোট সংস্থায় ভেঙে নিয়ে কম সুদের সুবিধা ভোগ করবে। একইভাবে তথাকথিত 'স্টার্ট আপ' সংস্থার জন্য করছাড়ের যে ঢালাও ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে এবার মুনাফার লোভে পুঁজির মালিকরা পিছনের দরজা দিয়ে নানা নতুন জায়গায় টাকা ঢালবে। অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক দাম কমতে থাকার সুবিধা ক্রেতা জনগণকে দেওয়ার পরিবর্তে পেট্রল-ডিজেলের খুচরো বিক্রির উপর বাজেটে ১ শতাংশ সেস চাপানো হয়েছে যা সমস্ত পণ্যের দাম আরও বাড়িয়ে দেবে। বিপরীতে, যে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির ক্ষেত্রে এখন বেসরকারি ব্যবসায়ীদেরই রমরমা, সেখানে আমদানি শুল্কে ছাড় দিয়ে তাদের মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। চড়া দামের কারণে এলপিজি এবং বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমাগত গ্রামীণ দরিদ্রদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এ কথা জানা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী এই পরিষেবার সুযোগ পাওয়া না-পাওয়া জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বলে মন্তব্য করেছেন। বাস্তবে, বাজেটের সমস্ত ঘোষণাগুলিই শুধুমাত্র পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের মুনাফার সুবিধার জন্য, জনসাধারণের জীবনধারণের সুবিধার জন্য নয়।

স্বভাবতই শিল্পপতি-মহল, শেয়ার ব্যবসায়ী, শাসক একচেটিয়া কারবারিদের বেতনভুক অর্থনীতির পণ্ডিতদের দল এই বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু খেটে-খাওয়া মানুষকে এর সর্বনাশা পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কারণ বিজেপির মতো শাসক শ্রেণির বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ম্যানেজাররা পুঁজিবাদের ক্রমাগত তীব্র হতে থাকা যে সংকটগুলি আড়াল করতে চায়, তার বোঝা বহন করতে হয় মেহনতি জনতাকেই। তাই ক্রমবর্ধমান এই অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

(ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।)

শৈশব ও ছাত্রজীবন

রামজয় তর্কভূষণ হন হন করে হেঁটে চলেছেন। প্রথম নাতি হয়েছে। ভীষণ খুশি তিনি। খবরটা তাড়াতাড়ি ছেলেকে দিতে হবে। ছেলে তখন কুমোরগঞ্জের হাটে গিয়েছে। পথেই দেখা হয়ে গেল। আনন্দের সঙ্গে নাতি হওয়ার খবর ছেলেকে দিলেন।

দিনটা ছিল ইংরেজি ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। মেদিনীপুর জেলার (তৎকালীন হুগলি জেলার) অখ্যাত গ্রাম বীরসিংহের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হল। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন দরিদ্র কিন্তু মহৎ, অকুতোভয় ও চরিত্রবান ব্যক্তি। তাঁর বড় ছেলে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিকার প্রয়োজনে সামান্য ইংরেজি শিখে কলকাতায় মাসিক দু'টাকা বেতনে কাজ করতেন। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর প্রথম সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র। পরবর্তীকালে এই শিশুই 'বিদ্যাসাগর' নামে ভারত বিখ্যাত হন।

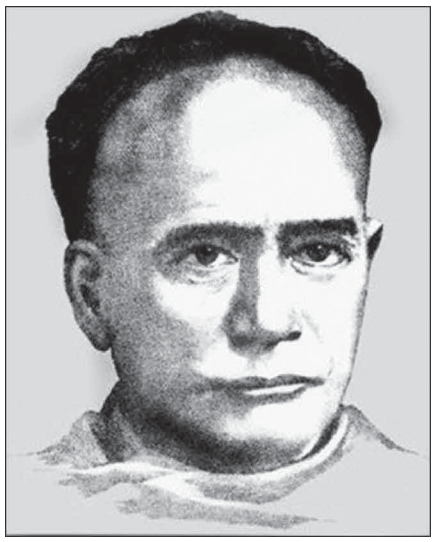

মা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদার আদর-যত্নে শিশু ঈশ্বর পাঁচ বছরের হলেন। গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হল তাঁকে। পড়াশোনায় খুবই আগ্রহ থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন প্রচণ্ড দুরন্ত। স্কুলে যাওয়ার পথে চুপি চুপি লোকের বাগানের ফল খেয়ে চলে আসতেন, ধানখেতের শিষ ছিঁড়ে চিবোতেন, গাছপালা নষ্ট করে দিতেন। এরকম নিত্য-নতুন অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। প্রতিদিন গুরুমশায়ের কাছে ঈশ্বরের নামে অভিযোগ আসত। লেখাপড়ায় সকলের চেয়ে ভাল ও মনোযোগী বলে গুরুমশায় তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ঈশ্বরের হাতের লেখাও খুব সুন্দর। এমন ছেলের দুরন্তপনায় গুরুমশায় রাগ করতে পারতেন না। আট বছর বয়সেই পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল ঈশ্বরের। ঠাকুরদাসকে ডেকে পাঠিয়ে কালীকান্ত বললেন— পাঠশালার পড়া ঈশ্বরের শেষ হয়েছে। ওকে আপনি কলকাতায় নিয়ে যান। সেখানে ইংরেজি শেখালে ভবিষ্যতে ভাল হবে।

ঠাকুরদাস ঠিক করলেন, ঈশ্বরকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। ওই টুকু ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে শুনে মা-ঠাকুরমা কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তাঁদের স্নেহ ছাড়া ঈশ্বর কীভাবে কলকাতায় থাকবে। কিন্তু কলকাতা ছাড়া গ্রামে লেখাপড়া করার সুযোগ নেই। তাই যাওয়ার দিন স্থির হয়ে গেল। তখনকার দিনে আজকের মতো যানবাহন ছিল না। পায়ে হেঁটেই কলকাতা যেতে হত। এতটা পথ বালকের পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়। তাই আনন্দরাম গুটিকেও সঙ্গে নিলেন। এ ছাড়া চললেন গুরুমশায় কালীকান্ত।

কখনও আনন্দরামের কাঁধে, কখনও পিতার কাঁধে, কখনও বা পায়ে হেঁটে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় চললেন। একদিনে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রথমদিন মামার বাড়ি পাতুলগ্রামে সবাই বিশ্রাম নিলেন, পরদিন কিছুদূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার পরের দিন শালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠলেন। রাস্তায় উঠেই ঈশ্বর লক্ষ করলেন কিছুদূর অন্তর বাটনাবাটা শিলের মতো এক একটি পাথর বসানো।

ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন— 'বাবা, বাটনাবাটা ওই শিলগুলো কেন রাস্তায় পোঁতা আছে'? ঠাকুরদাস হেসে বললেন—'ওগুলো শিল নয়, ওগুলোকে বলে মাইলস্টোন'

—'মাইলস্টোন কী বাবা'? —'মাইলস্টোন' হল একটি ইংরেজি কথা। এক মাইল হল আধ ক্রোশ রাস্তার সমান, স্টোন মানে পাথর। প্রতি এক মাইল অন্তর এরকম একটি করে পাথর বসানো আছে। এটির গায়ে লেখা আছে ইংরেজিতে উনিশ, অর্থাৎ এখান থেকে কলকাতা উনিশ মাইল দূর'। একেবারে শেষ পাথরটায় লেখা আছে 'এক'। এগুলি ইংরেজি সংখ্যা। পাথরে হাত দিয়ে ঈশ্বর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন—এটি কি এক, আর এটা নয়'? বাবা বললেন -'হ্যাঁ'।

ইংরেজি সংখ্যা ঈশ্বরচন্দ্র আগে শেখেননি, ঠিক করলেন পথে যেতে যেতে ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলবেন।

প্রত্যেকটি মাইলস্টোনের সংখ্যা মনোযোগ দিয়ে দেখে দশ নম্বর মাইলস্টোনের কাছে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বাবাকে বললেন— 'বাবা, আমি ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলেছি'।

ঠাকুরদাস একটু অবাক হলেন, বললেন— 'পরীক্ষা করব, কেমন শিখেছ। ন' নম্বর পাথর দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— এটা কত'?

ঈশ্বর উত্তর দিলেন— এটা নয়।

আট নম্বর পাথর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— এটা কত?

ঈশ্বরের উত্তর— এটা আট।

সাত নম্বর পাথরের সংখ্যাও ঠিক বললেন ঈশ্বর। বাবা ভাবলেন ছেলে হয়তো চালাকি করছে। দশের আগে নয়, নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত, এটা তো ঈশ্বর বাংলা সংখ্যায় শিখেছে তাই বোধ হয় বলে যাচ্ছে। ইংরেজি অঙ্ক হয়তো শেখা হয়নি। তাই ছ নম্বর পাথরটি ঈশ্বরকে অন্যমনস্ক করে না দেখিয়ে পাঁচ নম্বর পাথর দেখিয়ে ঠাকুরদাস ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন— এটা কত নম্বর বল দেখি?

ঈশ্বর একটু দেখে বললেন, বাবা এটা ছয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখে রেখেছে।

ঠাকুরদাস এবং গুরুমশায় কালীকান্ত খুব খুশি হলেন। গুরুমশায় ঈশ্বরের চিবুক ধরে আশীর্বাদ করে ঠাকুরদাসকে বললেন, — ঈশ্বরের পড়াশোনার ভাল ব্যবস্থা করবেন। বেঁচে থাকলে ও মানুষের মতো মানুষ হবে।'

ঠাকুরদাস কাজ করতেন রামসুন্দর মল্লিকের দোকানে। রামসুন্দরের লোহা পিতলের দোকান। যারা ধারে মাল কিনতেন তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে আনা ছিল ঠাকুরদাসের কাজ। বড়বাজারের দয়েহাটায় ভগবতী চরণ সিংহের একমাত্র ছেলে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে থাকতেন তিনি। নিজহাতে রান্না করে খেতেন। পুত্রকে রেখে ঠাকুরদাস কাজে চলে যান। মা-ঠাকুরমার জন্য ঈশ্বরের মন খারাপ করে, চোখে জল এসে যায়, কিন্তু সিংহ পরিবারের সকলের ভালবাসায় ও আদর যত্নে ঈশ্বর ধীরে ধীরে তাঁদের অভাব ভুলে যেতে থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র জগদ্দুর্লভ সিংহকে দাদা, তার বড়বোনকে বড়দিদি ও ছোটবোনকে ছোড়দিদি বলে ডাকতেন। রাইমণি ছিলেন তাঁর ছোড়দিদি। রাইমণি বিধবা। তাঁর একমাত্র ছেলে গোপাল ছিল ঈশ্বরের সমবয়সী। গোপালকে নিয়ে তিনি বাবার বাড়িতেই থাকতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহময়ী। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর স্নেহ ও আদর যত্ন গোপালের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। ঈশ্বর একটু অসুস্থ হলে রাইমণি তাঁর কাছে সারাক্ষণ বসে থাকেন, যত্ন করেন। বালক ঈশ্বরকে জামা-কাপড় পরিয়ে দেওয়া, স্নান-খাওয়ার দিকে নজর রাখা সবই রাইমণি নিজের ছেলের মতোই করতেন। ঈশ্বরের যাতে কোনও কষ্ট না হয়, এতটুকু অনাদরে অবহেলায় বালকের মন যাতে গুমরে না ওঠে, সেদিকে রাইমণি সবসময়ে সচেতন থাকতেন। বালক ঈশ্বরও 'ছোড়দিদির' কাছেই সবসময় ছুটে যেতেন।

রাইমণির স্নেহ, মা-ঠাকুরমার অভাব পূরণ করেছিল। পরের বাড়িতে আশ্রিত, এ কথা কোনওদিনই ঈশ্বর ভাবতে পারতেন না। রাইমণি তাঁর জীবনে এত ছাপ ফেলেছিলেন যে পরবর্তী জীবনে 'আত্মচরিত'-এ তিনি লিখেছেন—'আমি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন, ... যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ওই সমস্ত সদগুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূ-মণ্ডলে নাই'।

ছেলেবেলায় শুধু মা বা রাইমণি নয়, আরও বহু স্নেহময়ী নারীর চরিত্র তাঁর শিশুমনে নারীকে বিরাট মর্যাদার আসনে বসিয়েছিল। বাবার মুখ থেকে শুনেছিলেন তিনি কলকাতায় এক পরিচিত বাড়িতে থেকে প্রতিদিন রাতে ইংরেজি শিখতেন। রাতে কোনওদিনই তাঁর খাওয়া জুটত না। একদিন খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঠাকুরদাস রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক বিধবার মুড়ি মুড়কির দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। স্ত্রীলোকটি ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন— বাবাঠাকুর, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ঠাকুরদাস খাওয়ার জল চাইলে স্ত্রীলোকটি শুধু জল না দিয়ে কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাসের খাওয়ার তাড়া দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন— আজ বুঝি তোমার কিছু খাওয়া হয়নি বাবাঠাকুর?

ঠাকুরদাস বললেন, — না মা, এখনও কিছু খাইনি।

— দাঁড়াও বাবাঠাকুর, একটু দাঁড়াও, জল খেও না, বলে তিনি পাশের এক দোকান থেকে কিছু দই কিনে এনে আরও কিছু মুড়কি দিয়ে ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়ে ফলার করালেন। বলে দিলেন যেদিন খাওয়া জুটবে না সেদিন যেন সে এখানে এসে পেট ভরে খেয়ে যায়।

এই ঘটনা ঈশ্বরচন্দ্রের মনে খুবই ছাপ ফেলেছিল এবং স্ত্রী জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে 'আত্মচরিত'-এ তিনি লিখেছিলেন—'এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে ঠাকুরদাসের উপর কখনওই এরূপ দয়া প্রদর্শন করিতেন না'।

এই কথার মধ্যে নারীজাতির প্রতি তাঁর আবেগ ও শ্রদ্ধা যে কত গভীর ছিল তা বোঝা যায়। পরবর্তী জীবনে নারীর দুঃখ দূর করতে তিনি যে প্রাণপণে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, এই আবেগ ও শ্রদ্ধা তার একটি অন্যতম কারণ ছিল।

সিংহ পরিবারের সকলের ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতার জীবন শুরু হল। ন'বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮২৯ সালের ১ জুন সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। প্রথম কিছুদিন বাবার হাত ধরেই কলেজে যেতেন। তারপর একা যেতে লাগলেন। রোজ রাতে বাবার কাছে পড়া দিতে হত। বাবা না ফেরা পর্যন্ত ঘুমানোর উপায় নেই। কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়লে বাবা এসে বেশ মারধর করতেন। মারের ভয়ে চোখে সর্ষের তেল দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র জেগে থাকার চেষ্টা করতেন। একদিন মার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেলেন সংস্কৃত কলেজের কেরানি রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি। রামধন তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে, সঙ্গে করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যান। নিজে ভাল করে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি ঠাকুরদাস। তাই পুত্রকে দিয়ে নিজের ইচ্ছা পুরণ করতে চান।

ভাল করে লেখাপড়া শেখার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রেরও যত্নের অন্ত ছিল না। প্রায়ই বাবাকে বলতেন— বাবা, আমি রাত দশটার সময় খেয়ে উঠে শুয়ে পড়ব, রাত বারোটা বাজলে আপনি আমায় তুলে দেবেন। নয়ত আমার পড়া হবে না।

খেয়ে উঠে বাবা জেগে বসে থাকতেন, আরমানি গির্জার ঘণ্টা শুনে ঈশ্বরকে জাগিয়ে দিতেন। ঈশ্বর সারারাত পড়তেন। পরিশ্রমের ফলও পেলেন। ১৮৩১-এর মার্চ মাসের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক ৫ টাকা করে বৃত্তি পান ঈশ্বরচন্দ্র। সে সময়ের ৫ টাকা এখনকার পাঁচশো টাকার সমান। এরপরে মাত্র ১ বছর প্রথম হতে পারেননি। সেটা তাঁর তোতলামির জন্য। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলে তিনি 'তোতলা' হয়ে যেতেন। সেবারে ঈশ্বরচন্দ্র তাড়াতাড়ি এবং পরিষ্কার উত্তর দিতে না পারায় সাহেব পরীক্ষক তাঁকে প্রথম করেননি। এই একটি বছর ছাড়া প্রতি বছরই তিনি প্রথম হয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন ১৩ বছর, তখন পরের ভাই দীনবন্ধুকে কলকাতার বাসায় আনা হয়। সংসারে কঠোর দারিদ্র্য। পিতার ১০ টাকা বেতনে বীরসিংহের ও কলকাতার বাসার খরচ সবই চালাতে হয়। সারাদিন পেট ভরে ভাত জুটত না। কখনও বা শুধু নুনভাত খেয়ে কাটাতে হত। এত দরিদ্র পরিবারে শুধু লেখা পড়া করলে চলে না। ঈশ্বরের লেখাপড়া ছাড়াও অনেক কাজ। সকলাবেলা গঙ্গাস্নান সেরে আসবার পথে বাজার করে আনতে হয়। মশলা বাটা, মাছ তরকারি কোটা, তারপর রান্না করা সবই করতে হয় তাঁকে। সকলের খাওয়া দাওয়ার পর থালা-বাসন মেজে রান্নাঘর পরিষ্কার করে তারপর কলেজে যাওয়া, অনেকদিন আলো জ্বালার পয়সা থাকত না। তাই রান্না করতে করতে উনুনের আলোতে, কখনও বা রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলোতে পড়া মুখস্থ করতেন ঈশ্বরচন্দ্র। কলেজে যাওয়ার পথে চলতে চলতেও পাঠ মুখস্থ চলত। এত অধ্যাবসায়,

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

স্বাস্থ্য দফতরের অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ

অর্থ দপ্তরের ২০১১-র আদেশনামার ভিত্তিতে যাঁদের স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল সরকারি নানা টালবাহানায় আজও তাঁরা অস্থায়ী রয়ে গিয়েছেন। মাত্র ৫০ টাকা, ৯০ টাকা কিংবা ১০০ টাকা মজুরিতে স্বাস্থ্য দফতরের এই ডেইলি রেটেড কর্মীরা রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে ২০-২২ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন। তাও মাসে সব দিন কাজ নেই। আবার মাসের পর মাস বকেয়া। প্রতিবাদ করলে ভয় দেখিয়ে, জোর করে বেসরকারি এজেন্সিতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ২০১৬ সাল থেকে স্থায়ী করার জিগির তুলে বারে বারে কর্মীদের নানা তথ্য চাইছে স্বাস্থ্য ভবন। অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মীদের কয়েক লক্ষ টাকার মজুরি বকেয়া পড়ে আছে। এর প্রতিবাদে ২৬ জুন সমস্ত কর্মচারীদের অভিন্ন মজুরি, সমকাজে সমবেতন, সারা মাস কাজ, অর্থদপ্তরের আদেশনামা স্থায়ীকরণ, এজেন্সি প্রথা বাতিল, পরিচয়পত্র ও পোশাক সহ বিভিন্ন দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে করুণাময়ী থেকে স্বাস্থ্যভবনের উদ্দেশে সুসজ্জিত মিছিলে সামিল হন স্বাস্থ্য দফতরের কয়েকশো অস্থায়ী কর্মী।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শুভাশীষ দাস ও বিশ্বজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য অধিকর্তার সাথে দেখা করে একটি স্মারকলিপি দেন। অধিকর্তা সমস্ত দাবির সাথে একমত হন এবং স্থায়ীকরণের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কমরেডস সন্ধ্যা বরাট, শ্যামল রায়, বিভাস ঘোরাই এবং প্রসেনজিৎ রানা।

দীর্ঘ আন্দোলনের জেরে ১০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি

ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির লাগাতার আন্দোলনের জেরে অবশেষে হোসিয়ারি শিল্পের মেকার মালিকরা ১০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলেন। সম্প্রতি দেউলিয়া হীরারাম হাই স্কুলে আহুত হোসিয়ারি শ্রমিকদের এক সভায় এ কথা জানান ইউনিয়নের সভাপতি মধুসূদন বেরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য শ্রম দপ্তর প্রতি বছর দু'বার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেও এ জেলায় মালিকরা নানা অজুহাতে শ্রমিকদের তা দেয় না। ইউনিয়ন দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে শ্রমমন্ত্রীর নির্দেশে সমস্ত মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির যৌথ সভা আহ্বান করেন রাজ্যের লেবার কমিশনার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব মেদিনীপুর এলাকার মেকার মালিকরা শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে ১০ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর হবে ১ এপ্রিল ২০১৯ থেকে। ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক নেপাল বাগ বলেন, ওই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিকদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভায় ওই মজুরি বৃদ্ধির যৌথ স্বাক্ষরযুক্ত চার্ট শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। শতাধিক শ্রমিক ওই সভায় যোগ দেন।

সার্ভিস ডাক্তারদের কোটা বাতিলের প্রতিবাদ

সরকারি চিকিৎসকদের এম ডি/ এম এস পড়ার ক্ষেত্রে সার্ভিস কোটা বাতিলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ১ জুলাই কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক তরুণ নস্কর, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র প্রমুখ। কনভেনশনে শতাধিক চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস সহ বক্তারা প্রত্যেকেই বলেন— পশ্চিমবঙ্গের ৮০ ভাগ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই স্বাস্থ্যব্যবস্থা টিকে রয়েছে সরকারি চিকিৎসকদের উপরেই। বহু বছর ধরে এ রাজ্যে সরকারি চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে এম ডি/এম এস/ডিপ্লোমা পড়ার ক্ষেত্রে সার্ভিস কোটার সুযোগ রয়েছে। নতুন পাশ করা ডাক্তাররা অনেকেই এই সুযোগের আশায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাকরিতে যোগ দেন। এই সুযোগ তুলে নিলে ডাক্তারদের সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার প্রবণতা কমবে। অন্যদিকে রাজ্যে আজ গ্রামীণ অঞ্চলে ৯৩ ভাগ বিশেষজ্ঞের পদই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞের অভাবে জেলার মেডিকেল কলেজ সহ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালগুলি ধুঁকছে। সরকারি ডাক্তারদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেলে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞের অভাব আরও বাড়বে। ভেঙে পড়বে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। দরিদ্র সাধারণ মানুষ হারাবে চিকিৎসার অধিকার ও সুযোগ।

পার্থসারথি সেনগুপ্ত বলেন, "কোনও সরকার যদি মনে করে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালানোর জন্য ডাক্তারদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া দরকার তা হলে প্রয়োজনে তার জন্য বিশেষ আইনও পাশ করাতে পারে।' প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, সরকার আজ জনস্বার্থ বিরোধী স্বাস্থ্যনীতি প্রয়োগ করে যেভাবে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণ করছে, তার জন্য সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামোর ঘাটতি, ডাক্তার নিগ্রহের মতো ঘটনা লাগাতার ঘটছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়া তারই অঙ্গ বিশেষ।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

সাতের পাতার পর

এত সাধনা না থাকলে প্রতি বছর কলেজে বৃত্তি পাওয়া সম্ভব হত না। এত দারিদ্রের মধ্যেও পুত্রের বৃত্তির টাকা সংসার খরচের কাজে লাগাতেন না ঠাকুরদাস। বাবার কথামতো সে টাকায় কিছু বই কিনতেন ঈশ্বরচন্দ্র। এছাড়া খরচ তাঁর অনেক।

জলখাবারের সময় গরিব ছেলেদের ডেকে তিনি জলখাবার দিতেন। কারও ছেঁড়া কাপড় দেখলে নিজের কাছে পয়সা না থাকলেও কারও কাছে ধার করে কাপড় কিনে দিতেন। বাসায় কেউ এলে তখনই জলখাবার খেতে দিতেন। ওইটুকু বয়সেই কারও অসুখ হয়েছে শুনলেই তক্ষুণি ছুটে গিয়ে তার সেবা শুশ্রূষা করতেন। যে কোনও ছোঁয়াচে রোগীরও সেবা করতেন হাসিমুখে, বিনা দ্বিধায় তার মলমূত্রও পরিষ্কার করে দিতেন। কলকাতা থেকে যখন দেশে আসতেন, সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতেন। তাঁর এই স্বভাবের জন্য দেশের লোকেরা ওইটুকু ছেলেকেই 'দয়াময়' বলে ডাকতেন।

ওইটুকু বয়সেই সংস্কৃতে কথা বলতে পারতেন, অনুষ্ঠানে সংস্কৃত কবিতা রচনা করে দিতেন। তার ভাষা এত সুন্দর যে সবাই অবাক হয়ে যেত। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি অলঙ্কার শ্রেণিতে প্রবেশ করেন। অলঙ্কারশাস্ত্র বড়ই কঠিন, এই শ্রেণিতে তিনিই ছিলেন বয়সে সবচেয়ে ছোট। এক সময় তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও মধুসূদন বাচস্পতির বাসায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়তে যেতেন। একদিন সেই বাসায় তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এসেছেন। অল্পবয়স্ক বালক ঈশ্বরকে 'সাহিত্যদর্পণ' পড়তে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'এই বালক কি সাহিত্যদর্পণ বুঝতে পারে?'

বাচস্পতি বললেন—'কী রকম শিখেছে জিজ্ঞেস করে দেখুন'।

ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যদর্পণের একটি অংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর মুখে সেই অংশের সহজ সরল ব্যাখ্যা শুনে অবাক হয়ে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বলেছিলেন—'এত ছোটছেলের মুখে সাহিত্যদর্পণের এমন সুন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা আমি শুনিনি। এই বালক বড় হলে বাংলাদেশের একজন অদ্বিতীয় লোক হবে'।

গর্বের সঙ্গে তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলেন—'আমরা এই বালককে কলেজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ মনে করে থাকি"।

১৮৩৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জজ পণ্ডিতের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু হিন্দু আইন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার কাজ তিনি করতে আগ্রহী হননি।

মাত্র ২১ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে পাশ করলেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি, অলঙ্কার ইত্যাদিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারলে সংস্কৃত কলেজ থেকে সেই কৃতী ছাত্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হত। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে থেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হল। (চলবে)

প্রকাশিত হল

ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন

(একাদশ সংস্করণ)

প্রভাস ঘোষ

মূল্য-১৫ টাকা

কেন্দ্রীয় বাজেট কৃষকস্বার্থ বিরোধী ঃ এআইকেকেএমএস

৫ জুলাই অল ইন্ডিয়া কিষান ও খেতমজদুর সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, "এই বাজেট কৃষক ও গরিব জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী। ডিজেল এবং পেট্রোলে কর বৃদ্ধির ফলে কৃষি উৎপাদন খরচ বাড়বে। সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়বে।"

তিনি বলেন, "খরার প্রকোপে বিপন্ন কৃষকদের সাহায্য করার বদলে সেচের বরাদ্দে ৪৩৩ কোটি টাকা ছাঁটাই করা হয়েছে। কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা এবং ভূমিহীন খেতমজুরদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে একটি শব্দও বলা হয়নি এই বাজেটে। ঋণ মকুব ও ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতি ভোলানোর জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে যে 'কিষান সম্মান নিধি'র প্রচার হয়েছিল, বাজেটে সে প্রসঙ্গেও কোনও কথা বলা হয়নি।" জনবিরোধী এই বাজেটের বিরুদ্ধে দরিদ্র শোষিত কৃষকদের একজোট হয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এআইকেকেএমএস।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com